ভূমি ব্যবহারের কোনও নীতিই নেই

দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের ভূমিসংস্কার নিয়ে দেশে ও কিছু বিদেশে অনেক তথ্যভিত্তিক ও তাত্ত্বিক লেখা হয়েছে। দু - পর্বের ভূমিসংস্কার হয়েও গেছে অনেক দিন আগে। প্রথম পর্ব হয় ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ -৭০ এবং দ্বিতীয়টি হয় ১৯৭৮-৭৯তে। প্রথমে প্রায় ১০লক্ষ একর উর্বর কৃষি জমি আইন মাফিক সরকারে ন্যস্ত হয়। এতে পশ্চিমবঙ্গের জমি নির্ভর আভিজাত্য (aristocracy) একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এরই জন্য মধ্য ও উচ্চ চাষি সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে অনেকটা এগিয়ে আসে। এর ফল পরিস্কার ভাবে দেখা যায় উৎপাদনের অগ্রগতিতে। দ্বিতীয় পর্ব অপারেশন বর্গা হয় ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৯-এর মধ্যে যাতে প্রায় ১২ /১৩ লক্ষ বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত করা হয় এবং তারা security of tenure এবং ফসলের ন্যায্য ভাগের অধিকারী হয়।

বামফ্রন্ট ও তার শ্রেণীভিত্তি ঃ

১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন করে ঐ ব্যবস্থা পুনরায় চালু করে। এই ক্ষমতা বিকেন্দ্রকরণে মূলত লাভবান হয় মধ্য ও উচ্চ চাষি শ্রেণী। অভিজাত শ্রেণীর অর্থনৈতিক মেদন্ড ভেঙে যায় ১৯৬৭-৭০-এ, বাড়তি জমি অধিগ্রহণের ফলে। তারা গ্রামীণ সমাজ ও রাজনীতি থেকে ক্ষমতাচ্যুত হয়। ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্টকে প্রায় ৬০/৬৫ হাজার প্রার্থী দাঁড় করাতে হয় পঞ্চায়েতের জন্য। সিপিএম-এর এত সদস্য তো দূরে থাক, সক্রিয় সমর্থকও সেইসময় ছিল না গ্রামবাংলায় । মধ্য ও উচ্চ চাষিরা সিপিএমকে বেশ ভয় করত ও তারা কংগ্রেস সমর্থক ছিল। রাজনৈতিক বাতাবরণ বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা দেখল যে, বাম টিকিটে যদি তারা ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত দখল করতে পারে, তাহলে তাদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করতে সুবিধে হবে। সিপিএম-ও তত্ত্বগতভাবে মধ্য ও উচ্চ চাষিকে শ্রেণীশত্রু মনে করে না। কাজেই মণি- কাঞ্চন যোগ হল। মধ্য ও উচ্চ চাষিরা অভিজাতদের সরিয়ে ক্ষমতায় এল এবং সিপিএম - ও তাদের স্থানীয় ভিত্তি তৈরি করে ফেলল। সংখ্যাগতভাবে ১৯৭৮ -এর নির্বাচনে মাত্র শতকরা ৭ ভাগ পঞ্চায়েত সদস্য ছিল বর্গাদার বা ভূমিহীন চাষি। আর শতকরা ৯৩ ভাগ ছিল জমির মালিক বা মালিক পরিবারভুক্ত। বেকায়দায় পড়ে সিপিএম তখন বলল যে আসলে শতকরা ৫০ ভাগের বেশি ভূমিহীন, কারণ শিক্ষক সদস্য ছিল শতকরা ৫০ ভাগ। এটা মিথ্যাচার। পশ্চিমবঙ্গে দায়ভাগ রীতি অনুযায়ী উত্তরাধিকার হয়। ফলে পিতার বর্তমানে পুত্র কোনও অর্জিত সম্পত্তির মালিক হয় না-- যা মিতাক্ষরা ব্যবস্থায় হয়। তাই একটা ছেঁদো কুতর্ক করে ভূমিহীন সদস্যদের সংখ্যা বাড়াবার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তাতে নবগঠিত পঞ্চায়েতের শ্রেণীচরিত্রের কোনও পরিবর্তন হয়নি।

এর একটা সুফল হয়েছিল। মধ্য ও উচ্চ চাষিরা মূলত উৎপাদক শক্তি নির্ভর, খাজানা নির্ভর নয়। তাই ক্ষমতায় এসে গ্রাম উন্নয়নের জন্য যে প্রচুর টাকা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে খরচ হতে লাগল, তার বেশ কিছু অংশ তারা নিজেদের শ্রেনীস্বার্থে 'micro public works in support of agriculture' করতে লাগলো। যখন কৃষিতে গণবিনিয়োগ কমে, সেই সময়ে এই ধরনের, ছোট হলেও, বিনিয়োগের ফলে কৃষির অগ্রগতির সাহায্য করে। এটা প্রথমপর্যায়ের ভূমি সংস্কারের বিলম্বিত সুফল।

কৃষিতে অগ্রগতির হার নিন্মমুখী কেন ঃ

ফ্লাউড কমিশন(১৯৪০)-এর মতে বর্গ জমির পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ। যদিও NSSO মতে শতকরা ৭ ভাগ। জমির অধিকারের ব্যাপারে NSSO খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়, একারণে য়ে উত্তরদাতারা সম্পত্তি বা জমির ব্যাপারে সরকারি সমীক্ষাকারীদের কাছে সত্যি কথা বলতে ভয় পান ----যা consumer expenditure -এর বেলা হয় না। কাজেই শতকরা প্রায় ২০ ভাগ কৃষি জমি নথিভুক্ত বর্গাদারের হাতে থাকায় সেখানে চাষের উন্নতি করার একটা প্রচেষ্টা শু হয় যতদূর পর্যন্ত শ্রম পুঁমিকে প্রতিস্হাপন করতে পারে ততদূর পর্যন্ত। সেভাবেই প্রায় দশ লক্ষ একর উদ্বৃত্ত জমি বিতরণের ফলে ভূমিহীন প্রান্তিক চাষীরা এই অগ্রগতিতে যোগ দেয়। ফলে ১৯৮২-১৯৮৩ থেকে ১৯৯২ - ১৯৯৩ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে কৃষির অগ্রগতি বছরে প্রায় শতকরা ৫ / ৬ ভাগ হতে থাকে যা গত ১০০ বছরে হয়নি। কিন্তু নববইয়ের মাঝামাঝি থেকে অগ্রগতির হ্রাস হতে শু করেছে এবং কিছু অর্থনীতিবিদদের আশঙ্কা যে এররেখাচিত্র এবার সমতল হয়ে যাবে।

ফ্লাউড কমিশন ১৯৪০ সালে জমিদারি প্রথা তুলে দেবার ও বর্গাদাররের রায়তী সৃত্ব দেবার সুপারিশ করে গেছে। কিন্তু নথিভুক্ত না হলে কাকে রায়তী সৃত্ব দেওয়া হবে তা নিয়ে সংশয় থেকে যেতে পারে। কিন্তু এখন যখন ১৬ লক্ষ বর্গাদার নথিভুক্ত হয়ে গেছে তাদের রায়তী সৃত্ব দিতে না পারার কোনও কারণ নেই। কিন্তু তা দেওয়া হবে না কারণ এটা মধ্যে বা উচ্চ চাষীদের স্বার্থর পরিপন্থী। গত ২৬ বছর ক্ষমতায় থাকার পরও পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি রায়তী সৃত্ব না দিয়ে থাকে তাহলে আগামী ২৫ বছরেও যে এরা এটা দেবে তা মনে হয় না। মালিকানা না পেলে জমির স্থায়ী উন্নতি করা সম্ভব নয়। আজ না মালিকের ইচ্ছা আছে না বর্গাদারের ক্ষমতা আছে। বর্গাদার জমির মালিক হলে সেই জমি বন্ধক হিসেবে ব্যবহার করে দীর্ঘ পর্বের উন্নতিকরণ ঋণ (Long Term Land Improvement Loan) পেতে পারে । তা পেলেই কিন্তু আর একটা জোয়ার আসতে পারে।

আরও একটা কারণ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানিক কৃষি ঋনের অভাব। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রীর মতে এ রাজ্যের বাৎসরিক কৃষি ঋণের প্রয়োজন ১০,০০০ কোটি টাকার। কিন্তু প্রতিষ্ঠানিক ঋণ পাওয়া যায় মাত্র কম বেশি ৮০০ কোটি টাকার । খারাপ credit-deposit rate দেখিয়ে কেন্দ্র কেন্দ্র করে চিৎকার করে ব্যাপারটাকে গুলিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে। সমবায়ের মাধ্যমে যেখানে RBI / NABARD direct credit line আছে তাকে মজবুত করার প্রচেষ্টা গত ২৫ বছরে করা হল না কেন ? যদি মাত্র ৮০০ কোটি টাকা প্রতিষ্ঠানিক ঋণ হয়, তাহলে বাকি ৯২০০ কোটি টাকা ব্যক্তিগত উৎস থেকে আসছে। সেই উৎস চিরাচরিত সাহুকার ছাড়া উচ্চ চাষি, যাদের হাতে গত ১৫ - ২০ বছর প্রচুর টাকা এসেছে, তারাই নিশ্চয়ই এই ঋণ দিয়ে থাকে। তারাইতো পঞ্চায়েত ও গ্রামে বামফ্রন্টকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সত্যিকারের সমবায় আন্দোলন করে তাদের ব্যবসায়ে হাত দেবার সাহস কার আছে ? কিন্তু এই অবস্থা যদি শুধরানো না যায়, কৃষির অগ্রগতি প্রতিহত হবে। এবং হতে আরম্ভ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে একটি প্রধান অসুবিধা হচ্ছে জোতগুলির ক্ষুদ্রাতিকরণ (fragmentation of holding)। হরেকৃষ্ণ কোনার বা বিনয় চৌধুরী কেউ জমির একত্রীকরণের (consolidation of holding)। পক্ষে ছিলেন না। অথচ একত্রীকরণ না হলে ভালোভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব নয়। প্রতাপ সিং কায়রোঁ জোর করে পাঞ্জাবে একত্রীকরণ করেছিলেন বলে এত তাড়াতাড়ি ওখানে সবুজ বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল। বাম নেতাদের ধারণা যে জমি একত্রীকরণ করলেই ছোট ও প্রান্তিক চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই ধারণার যৌক্তিকতা নেই তা নয়। তবে তাদের এরকম ক্ষতি যাতে না হয়, তার জন্য আইনি ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার আইনে বলা আছে যে, consolidation of holding-এর প্রথমত এক হেকটর পর্যন্ত জমির মালিকদের জন্য করা হবে। এদের জমি একত্রীকরণ হয়ে গে
লে যদি বড় চাষিরা একত্রীকরণ করতে চায়, তাহলে তাদের করা হবে। প্রথমেই যদি ছোট জমিগুলো একত্রীকরণ করা হয় তাহলে বড় চাষিরা পরে তাদের ঠকিয়ে ভালো জমি হস্তগত করতে পারবে না। আইনের এ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক ইচ্ছার অভাবে এ-কাজ পশ্চিমবঙ্গে হবে না। ফলে কিছুদুর যাওয়ার পর কৃষিতে প্রযুক্তি সম্প্রসারণ আর সম্ভব হবে না। ফলে বৃদ্ধির হারও পড়ে যাবে।

এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে জমি ব্যবহার (land use) সম্পর্কে কোনও সুষ্ঠু নীতি নেই। যেখানে সেখানে ইঁটের ভাটা ও বালির খাদ হচ্ছে। দক্ষিণ ২৪-পরগণার কিছু জায়গায় গেলে মনে হয় moonscape দেখছি। ভালো সুন্দর চাষযোগ্য জমিকে ক্ষতবিক্ষত করে যত্র তত্র ইঁট ভাটা করা হয়েছে। যেখানে ইঁট ভাটা হয়, সেখানে চাষ করা সম্ভব নয়। ইঁট ও বালির প্রয়োজন আছে। তার জন্য কি পরিবেশ সহায়ক যুক্তিগ্রাহ্য নীতি প্রণয়ন করা যায় না ? দক্ষিণ ২৪ পরগণায় প্রচুর মজে যাওয়া নদী খাল আছে। সেগুলোর মধ্যে ইঁটের ভাটা করলে নদীটার সংস্কারও হয়ে যায় এবং পাশের চাষের জমি নষ্ট হয় না। এর জন্য বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা ও পরিকল্পনা করা সম্ভব, যদি ইচ্ছা থাকে। হুগলি জেলায় সরস্বতী নদী লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু শুনেছি satellite imagery-তে নাকি ঐ নদীর খাত বোঝা যায়। যদি তাই হয়, তাহলে জিটি রোডের দুধারে বালি খাদ না করে ঐ নদীর খাত অনুযায়ী খাদ করলে নদীকেও পুনর্জ্জীবিত করা যায় এবং জিটি রোডকে ধবংসের হাত থেকে বাঁচানো যায়। উত্তরবঙ্গের নতুন চা বাগান ও দক্ষিণবঙ্গের চিংড়ির ভেড়ি তো মাস্তান যার জমি তার এই নীতিতে চলছে। সরকার কোথাও আছে বলে তো মনে হয় না। জমি ব্যাবহারের ক্ষেত্রে এ রাজ্যে এক নীতিহীন নৈরাজ্য চলছে। সরকার এ ব্যাপারে কিছুই ভাবছে না। সিভিল সমাজ কী ভাবছে তা আমার জানা নেই। ভবিষ্যতে কৃষিযোগ্য জমি সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে হলে একটা বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিগ্রাহ্য পরিবেশ সহায়ক জমি ব্যবহার কার্যত্রম তৈরি করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। যাঁরা পরিবেশ নিয়ে কাজ করেন, তাঁদের এ বিষয়ে অগ্রণী জনমত গঠন করার দায়িত্ব আছে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com